পরিবেশবাদীদের অসত্য ভাষণ

এবনে গোলাম সামাদ

03. 02. 2010

কিছুদিন আগে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যে হারে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে, তাতে ২০৩৫ সালের মধ্যে হিমালয় পর্বতমালার সব বরফ গলে যাবে। হিমালয় পর্বতমালা হয়ে পড়বে বরফশূন্য। কিন্তু এখন জাতিসংঘের পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে, তাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক নয়। তারা এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। জাতিসংঘের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের প্যানেলের প্রধান রাজেন্দ্র পচুরী বলেছেন?ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল দুঃখজনক ভুল। কিন্তু জাতিসংঘের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এরকম ভুল করাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। মনে হয় এর পেছনে ছিল কিছুটা রাজনৈতিক মতলববাজি। যেটাকে এখন আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি বলছে, হিমালয় পর্বতমালার বরফ গলে যাওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী তারা করেছিলেন, তার পুরোটাই ছিল অনুমানভিত্তিক। এ ব্যাপারে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো দলিল-প্রমাণও তাদের হাতে নেই। জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান যদি এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তবে অন্য আরও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তথ্য-প্রমাণহীন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। আর তাই আমাদের এ ব্যাপারে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবন। সুন্দরবনের ভবিষ্যত্ নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মেরু অঞ্চলে বরফ গলছে। ফলে বাড়ছে সমুদ্রের পানি। এছাড়া তাপমাত্রা বাড়ার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে পানির আয়তন। বঙ্গোপসাগরের পানি গ্রাস করতে যাচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চলকে। কিন্তু একথা কতটা ঠিক এবং এ নিয়ে কতটা গবেষণা হয়েছে, তা আমাদের বলা হচ্ছে না। হয়তো দেখা যাবে, এক্ষেত্রে যা বলা হচ্ছে তাও সঠিক নয়। যা বলা হচ্ছে তা কেবলই অনুমাননির্ভর। সুন্দরবন এলাকা নিয়ে ইংরেজ আমলে অনেক কথা উঠেছিল। সে আমলে একাধিক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন?সুন্দরবনের জমির অবনমন (ঝঁনংরফবহপব) ঘটছে। সুন্দরবনের ঠিক নিচেই সমুদ্রের গভীরতা ৫০ থেকে ৬০ ফুট। কিন্তু এই সমুদ্রতীর থেকে ১৫ মাইল দূরে এর গভীরতা হয়ে দাঁড়ায় ১৭০০ থেকে ১৮০০ ফুটের মতো। সুন্দরবনের মাটির চাপে তলার মাটি এই ঢালের দিকে সরে যেতে চায়। ফলে ঘটে সুন্দরবনের জমির অবনমন। আর সমুদ্রের পানিতে ভরে যেতে চায় অবনমিত অংশ। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে?সুন্দরবনের অনেক অংশ বঙ্গোপসাগরের পানিতে ডুবতে যাচ্ছে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। এক্ষেত্রেও হয়তো আমরা অচিরেই দেখতে পাব, একটা ভুল ধারণাকেই এতদিন প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। সুন্দরবনে নির্বিচারে কাঠ কাটা হচ্ছে, যা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আর সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু মাটি দেবে যাওয়াকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি তা হলো, সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে পানি সেচে ফেলে ডুবে যাওয়া জমির পুনরুদ্ধার। কিন্তু এর প্রযুক্তি আমরা এখনও জানি না। ইউরোপে সমুদ্র সেচে আবাদি জমি উদ্ধারে বিশেষভ সাফল্য লাভ করেছে নেদারল্যান্ডস (ঘবঃযবতষধহফং) অথবা হল্যান্ড। আমরা এ কাজে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি। আমরা তাদের কাছে চাইতে পারি প্রযুক্তিগত

সাহায্য।

ওলন্দাজরা বহুদিন আগে থেকেই অগভীর সাগর থেকে পানি সেচে ফেলে আবাদি জমি বের করার কৃতকৌশল আয়ত্ত করেছে। প্রথম দিকে তারা পানি সেচার কাজে ব্যবহার করেছে প্রবাহমান বায়ুর শক্তিকে। আমরাও চেষ্টা করতে পারি বায়ুচালিত কলের (ডরহফ সরষষ) সাহায্যে। ওলন্দাজরা এখন বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে, উত্তর সাগরের পানি বাড়ার ফলে যাতে তাদের রাজধানী আমস্টারডাম (অসংঃবতফধস) ডুবে না যায়। এছাড়া তারা এখনই গড়তে শুরু করেছে অগভীর সমুদ্রে বিশেষ ধরনের পিলার স্থাপন করে তার ওপর ইমারত নির্মাণ। জলবায়ু পরিবর্তন আমরা বন্ধ করতে পারব না। আমরা যা চেষ্টা করতে পারি তা হলো, এর ক্ষতির হাত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজেদের রক্ষা করতে। হা- হুতাশ করে কোনো সমাধান আসতে পারবে না। বলা হচ্ছে, বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ার ফলে বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে। ফলে আসছে জলবায়ুতে পরিবর্তন। তাই কমাতে হবে প্রত্যেক দেশকে তাদের কল- কারখানা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা। ভারত বলছে, একজন মার্কিন নাগরিক গড়পরতা প্রতিদিন যে পরিমাণ শক্তি (উহবত্মু) ব্যবহার করে, একজন ভারতবাসী গড়ে ব্যবহার করে তার বিশ ভাগের একভাগ মাত্র। ভারত যদি এখন তার কল- কারখানা থেকে তেল ও কয়লা পুড়ে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উতপন্ন হচ্ছে তার মাত্রা কমাতে চায়, তবে বাস্তবে তার অর্থ দাঁড়াবে, ভারতের একটা বিরাট অংশকে অর্থনীতির দিক থেকে অনগ্রসর করে রাখা। যেটা সে করতে পারে না। বলা হচ্ছে, দেশ হিসেবে চীন এখন যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উতপন্ন করছে, তা পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি। কিন্তু চীন বলছে, তার দেশের কল- কারখানার জন্য যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উতপন্ন হচ্ছে তার মাত্রা সে কমাতে পারবে না। ?ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ?- এর হিসাব অনুসারে উন্নত দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে ১৯৯০- এর মাত্রার ২৫ থেকে ৪০ ভাগ নিচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে রাজি হয়নি। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, সে মাত্র ২০ ভাগ কমাতে পারে। তার বেশি কমানো তার সম্ভব নয়। এরকম পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ করা সম্ভব নয়। অবশ্য জলবায়ুতে পরিবর্তন কেন আসছে, তা নিয়েও আছে যথেষ্ট বিতর্ক। সব বিশেষজ্ঞ মনে করেন না, জলবায়ুতে পরিবর্তন আসছে কেবল কল- কারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য। জলবায়ু পরিবর্তন নিবারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু করণীয় নেই। বাংলাদেশের নেই কল- কারখানার অর্থনীতি। সে এখনও মূলত একটি কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বিদেশের কাছে সাহায্য চাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষতি নিবারণে। কিন্তু এরকম কোনো সাহায্য সে পাবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মানুষকে সক্রিয় হতে হবে, যাতে করে সে পারে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি রোধ করতে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মনে গড়ে উঠেছে বিদেশনির্ভর অর্থনৈতিক সাহায্যপ্রাপ্তির ইচ্ছা। আমাদের ছাড়তে হবে এই ভিখারীসুলভ মনোবৃত্তি। আমাদের উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে।

হিমালয়ের বরফ গলার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ। যেটা ছিল খুবই অনুমাননির্ভর। আমরা ফারাক্কায় এমনিতেই পানি পাচ্ছি কম। ভারতীয় বিশেষজ্ঞ হয়তো প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, হিমালয়ের বরফ জমা কমার কারণে গঙ্গার পানি আসা কমেছে। আর তাই সম্ভব নয়

বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তি অনুসারে গঙ্গার পানি পাওয়া। গঙ্গায় যে পানি প্রবাহিত হয় তার একটা উতস হলো মৌসুমি বৃষ্টির পানি। আর একটি উতস হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা পানি। বরফ জমা কমে গেলে, তাই গঙ্গায় পানি প্রবাহ যে আগের মতো থাকা সম্ভব নয়, সেটা সহজেই অনুমেয়। ভারত গবেষণা করছে, চাঁদে পানি আছে কি- না, তা নিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে, সে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কোনো গবেষণা সেভাবে করতে চাচ্ছে না। অথচ সমুদ্রের পানি বাড়লে নাকি ভারতেরও ডুবে যাবে সমুদ্র উপকূলবর্তী ৬০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূমি। আমাদের দেশে রাজনীতি নেমে এসেছে খুবই নিচু পর্যায়ে। রাজনীতি কেবলই হয়ে উঠেছে দরবারি। দেশের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে মনে হচ্ছে কোনো দলই ভাবিত নয়। কিন্তু রাজনীতির একটা বড় উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত দেশের সমস্যা সমাধান। বিগত কোপেনহেগেন সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে যে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পাননি। বিরোধী নেত্রী করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা। কিন্তু এরকম সমালোচনা যথেষ্ট নয়। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল উভয়েরই থাকা দরকার দেশের সমস্যা সমাধানে ব্যবহারিক প্রস্তাব। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে হতে পারে মতপার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য নিয়ে, বিতর্ক করা গেলেও তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় ব্যক্তিগত ঝগড়ার পর্যায়ে।

(সুত্র, আমার দেশ, ০৩/০২/২০১০)